প্রবন্ধ

# তাকওয়া অর্জনে রোজার অবদান

**মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী**

রোজার সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যে হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা এবং অন্তরের পরহেজগারী ও পরিচ্ছন্নতা সাধন করা। মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া এবং পরহেজগারী অর্জন করতে পার। এই আয়াতে তাকওয়া অর্জনের দিক-নির্দেশনাকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং এর বিশ্লেষণ এভাবে উপস্থাপন করা যায়।

১. তাকওয়া বলতে অন্তরের সেই অবস্থাকে বুঝায় যা অর্জন করার পর যাবতীয় গুনাহসমূহকে সর্বাত্মকভাবে অন্তর ঘৃণা করে এবং গুনাহের প্রতি বৈরীভাবের উদয় ঘটে এবং একই সাথে নেক কথা ও কাজের প্রতি অন্তর জুড়ে শুরু হয় তীব্র আকর্ষণ। সুতরাং রোজার আসল মাকসুদ হচ্ছে এই অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হওয়া। এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের অন্তরসমূহে গুনাহ এবং পাপাচার দ্বারা পশু সুলভ শক্তিগুলো ব্যাপক হারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রোজা মানুষের এই প্রবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রোজা হচ্ছে এই সকল নওযোয়ানের জন্য নিজেকে সংবরণ করার হাতিয়ার যারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বিবাহ করতে সামর্থ্যবান নয়। সুতরাং তাদের জন্য নিজেদের নফস ও দৈহিক উত্তেজনাকে প্রতিহত করার মোক্ষম উপাদান হচ্ছে সিয়াম সাধনা। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'মানুষের জৈবিক তাড়নাকে প্রতিহত করার জন্য উত্তম অবলম্বন হচ্ছে রোজা।'

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

২. রোজার ফরযিয়াতের মাঝে যে একটি খাস ও নির্দিষ্ট হেকমত নিহিত আছে এবং এর মাঝে সার্বিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মূল দিক-নির্দেশনার ছাপ আছে তা ইসলামের বিভিন্ন আহকাম ও বিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায়। বছরের বারটি মাসের মাঝে একটি মাস মুসলমানদের এভাবে কাটানো উচিত যে, তারা দিন-রাতভর মাত্র এক বেলা আহার করবে এবং অবশিষ্ট একবেলার আহার্য বস্তু গরীব ভাইদের মাঝে বিতরণ করবে। একই সাথে ফেদিয়া এবং কাফ্‌ফারার হুকুম আহকামগুলোর প্রতি নজর দিলে বুঝা যাবে যে, রোজার বদলা হিসেবে গরীবদের মাঝে আহার্য বিতরণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে একথাও বুঝা যায় যে, রোজা এবং গরীবদেরকে আহার্য দেয়া পরস্পর একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত বা কায়েম মোকাম। এমন লোক যারা আসলেই কমজোর অথবা চিররুগ্ন অথবা লোকদের জন্য রোজার পরিবর্তে এই হুকুম দেয়া হয়। 'যারা অতি কষ্টে রোজা রাখতে পারে, তারা একজন মিসকীনের খাদ্য ফেদিয়াস্বরূপ প্রদান করবে। [সূরা বাকারাহ: রুকু- ২৪]

৩.একমাত্র রোজাই আমীর, গরীব ও পেটপুরে আহারকারীদের বদলে দেয় যে, অভুক্ত অবস্থার মাঝে কি যাতনা আছে এবং ক্ষুৎপিপাসার মাঝে কি বেদনা আছে। এর ফলে সে স্বীয় গরীব ও উপোষ ও দুর্দশাগ্রস্ত ভাইদের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার কথা উপলব্ধি করতে পারে এবং এ কথাও বুঝতে পারে যে, মাত্র কয়েকটি লোকমার দ্বারা তাদের দুঃখ-কষ্টের দূর করা কত বড় পুণ্যের কাজ। যে ব্যক্তি নিজে ক্ষুধার্ত নয়, ক্ষুধা সম্পর্কে যে ব্যক্তি পিপাসার্ত নয়, সে পিপাসার বেদনা ও কষ্ট সম্বন্ধে অনুমান করতে পারবে না। হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম বলেছেন, অন্তর জ্বালা বুঝতে হলে অন্তরে দাগ পড়া খুবই জরুরি। রোজা এই আত্মত্যাগ, উৎসর্গ দয়া এবং সমবেদনার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাল এই ছিল যে, কতিপয় সাহাবী বলেছেন 'রজমান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বদান্যতা প্রবহমান বাতাসের রূপ ধারণ করত।

[সহীহ বুখারী শরীফ: বাদউল অহী অধ্যায়]

এরই প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে আজও এই মাসে মুলমানগণ গরীবদের সাহায্য ও আর্থিক দান খয়রাত দ্বারা তাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণে এগিয়ে আসেন।

৪. মানুষ যতই প্রচুর্যে প্রতিপালিত হোক না কেন, ধন ও দৌলতের আধিক্য তার মাঝে যতই থাকুক না কেন, তবুও কালের পরিবর্তন এবং জিন্দেগীর টানাপোড়ন তাকে দৈহিক শ্রম ও বেদনা সহ্য করতে এবং যাতনা সহ্য করতে

বাধ্য করে তোলে। জিহাদের প্রতিটি ময়দানে ক্ষুধা পিপাসা সম্বরণ করা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। এ কারণেই মুসলমান মুজাহিদ সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে ক্ষুধা, পিপাসার যাতনাকে যেভাবে সহাস্য আননে বরণ করে নেয়, তা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মূলত, রোজা হচ্ছে বাধ্যতামূলক ট্রেনিং যা প্রত্যেক মুসলমানকে এক মাস করানো হয়। যেন সে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, চেষ্টা-তদবীর, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকে অতি সহজে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। এ কারণে রোজাকে আল্ ক্বোরআনে কখনো ধৈর্য শব্দের দ্বারাও বিশেষিত করা হয়েছে। যেন এর দ্বারা রোজার প্রকৃত হাকিকত প্রকাশ পায়।

৫.যেভাবে অধিক ক্ষুৎপিপাসার তাড়না মানুষকে দুর্বল ও দেহকে অসার করে তোলে, তেমনি এর চেয়েও বেশি পরিমাণে মানুষকে বিভিন্ন রোগ ও বিমারীতে নিমগ্ন করে তাদের মাত্রাতিরিক্ত পানাহার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় যে, অধিকাংশ সময়ে মানুষের ক্ষুৎপিপাসা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া কোন কোন রোগের ওষুধ হচ্ছে উপোস করা। ডাক্তারী শাস্ত্র মতে সপ্তাহে কমপক্ষে এক ওয়াক্ত পানাহার বন্ধ রাখা উচিত। ইসলামে সাপ্তাহিক মসনুন ও মুস্তাহাব রোজার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু একই সাথে বছরে একবার দৈহিক ফুজলা বা ক্ষতিকর বস্তুসমূহ নিস্প্রভ ও হাল্কা করার জন্য আবশ্যিকভাবে রোজা রাখা খুবই উপকারী। যে সকল মুসলমান রোজা রাখেন, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সাক্ষ্য দেবে যে রোজা কত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে এবং কি পরিমাণ রোগ-বালাই দূর করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো রোজাদার নিজে পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থাকে পরিহার করবে না। যদি তাই হয়, তাহলে এই সংযম ও অভুক্ত থাকাই তার দৈহিক রোগসমূহের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

৬. মানুষ যদি নিজের দিন-রাতের কর্ম-ব্যস্ততা ও কর্মকাণ্ডের উপর চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে যে, এর একটা বিরাট অংশ খাওয়া-দাওয়া, পানাহার ও এসবের আয়োজন এন্তজামে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। যদি মানুষ এক ওয়াক্তের খানাপিনা কম করে দেয় তাহলে সময়ের একটি অংশ বেঁচে যাবে। এই সময়টি আল্লাহর ইবাদত ও মাখলুকের সেবায় ব্যয় করতে পারবে। যদি এমনটি সব সময় সম্ভব না হয়, তাহলে কমছে কম এক মাস বা একবার অপ্রয়োজনীয় আবশ্যকতাকে কম করে এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

৭. মানুষের দেমাগী ও রূহানী একাগ্রতা এবং পবিত্রতার জন্য উপযুক্ত উপোস খুবই উত্তম ওষুধ। যখন মানুষের পাকস্থলী বদহজম এবং গোলযোগপূর্ণ বায়ূ হতে খালি হবে, এমনকি মন ও মস্তিস্ক পেটের পীড়ায় ছোবল হতে মুক্ত ও পবিত্র হবে, তখন আত্মিক একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা হাসিল করা খুবই সহজ হয়ে উঠবে। বড় বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই হাকীকতের সত্য-সাক্ষী হিসেবে সর্বযুগেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

৮. রোজা বহু গুনাহের কাজ হতে মাহফুজ ও নিরাপদ রাখে। তাছাড়া রোজা অনেক গুনাহের কাফ্ফারাও বটে। সুতরাং আলোচনাসমূহের মাঝে যেখানে রোজা এবং খয়রাতের অভিন্নতা এবং পরস্পর বদল হওয়ার কথার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো থেকেও একথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, রোজা ভুল-ত্রুটি এবং গুনাসমূহের কাফফারা বরং তৌরাত কিতাবে একে নির্দিষ্ট কাফফারা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [আহ্বার:১৬-৩০হতে২৪পর্যন্ত ও ২৩-২৭]

তাছাড়া ইসলামী অনুশাসনের বহুস্থানে একে কাফফারা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি কেউ শপথ গ্রহণ করে তা ভঙ্গ করার অপরাধ করে, তাহলে এই গুনাহ হতে নিস্তার লাভের উপায় হচ্ছে এই যে, দশজন মিসকীনকে আহার করাবে। যদি এর সামর্থ্য না থাকে তাহলে, 'তিনি দিনে রোজা পালন করবে, এটা তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারা সুতরাং তোমরা শপথ করার পর, তার হেফাজত করো।' [সূরা মায়িদাহ্: রুকু-১২]

৯. এই হাকীকতকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করলে রোজার পৃথক বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। রোজার ক্ষুৎপিপাসা আমাদের উত্তপ্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী শক্তিকে নিস্প্রভ ও নিস্তেজ করে তোলে। কিছুটা সময়ের জন্য আমরা শান্ত ও বিনম্র থাকতে পারি। এমনকি খানা-পিনার ব্যস্ততা হতে আমরা বিমুক্ত থাকতে পারি। অন্যান্য কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে আমরা বিরত থাকি। দিল ও দেমাগ, পরিপূর্ণ পাকস্থলীর ক্ষতিকর অপবিত্র বস্তুরাজির প্রভাব হতে মুক্ত থাকে। আমাদের অভ্যন্তরীণ আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে শান্তি, নিরাপত্তা ও নমনীয়তা প্রকাশ পায়। এই অবসর মুহূর্তগুলো শক্তির এই ভারসাম্যতা দিল ও দেমাগের এই প্রশান্ত অবস্থা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্থিরতা, আমাদের চিন্তা-ভাবনা, নিজের কাজ-কর্মের হিসাব ও কাজ-কর্মের প্রতি দৃষ্টি এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও লজ্জা ইত্যাদি আল্লাহর সামনে কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার ও শঙ্কা সৃষ্টির জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া গুনাহ্ থেকে তাওবা করা এবং লজ্জা ও শাস্তির অনুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এতে করে আমাদের নেক আমলের আন্তরিক শক্তি উজ্জীবিত

হয়ে উঠে। আমরা কর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ি। এ কারণেই রমজান মাস সর্বাংশে এবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যকর্মের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ মাসে রয়েছে তারাবীর নামায, এ মাসে রয়েছে এতেকাফের ব্যবস্থা এবং এ মাসে যাকাত দান করাও মুস্তাহাব। তাছাড়া দান খয়রাত করাও খুবই উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর দানশীলতার যদিও সীমা-পরিসীমা ছিল না, তবুও তা রমজান মাসে প্রবল বাতাস অপেক্ষাও প্রবলতর হয়ে উঠে।' [সহীহ বুখারী শরীফ: ১ম খ. অহী অধ্যায়]

১০.এ সকল কথা সামনে রেখে সহজেই বুঝা যায় যে, রোজা কেবল বাহ্যিক ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালা সহ্য করার নামই নয় রবং তা দিল এবং রূহের ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা সহ্য করার নাম হিসেবে 'তাকওয়াকে' নির্ধারিত করেছেন। যদি রোজার দ্বারা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণ না হয়, তাহলে বলা যাবে যে, দেহের রোজা পালন করা হয়েছে, কিন্তু রূহের রোজা পালন হয়নি। এই বিশ্লেষণকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'রোজা রেখেও যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও প্রতারণামূলক কাজ পরিত্যাগ না করবে,তাহলে এতে আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা মোটেই নেই যে, মানুষ খানা-পিনা পরিহার করবে।'

[সহীহ বুখারী শরীফ: কিতাবুস সাওম, ১ম খ. ২৫৫ পৃষ্ঠা, তিরমিজী: সাওম অধ্যায়, আবূ দাউদ: সাওম অধ্যায়- ২২৬ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ্ : ১২২ পৃষ্ঠা]

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজা ঐ সময় পর্যন্ত ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত এর মাঝে ছিদ্র না কর।'

[সুনানে দারমী: ২১৮ পৃ.মাজমাউল ফাওয়ায়েদ ১৫২ পৃ.]

তিনি আরও বলেছেন, 'রোজা খারাপ কর্ম হতে বিরত রাখার ঢালস্বরূপ। তবে যে রোজা রাখে তার উচিত কটু কথা না বলা এবং রাগ না করা, এমনকি কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদের জন্য প্রবৃত্ত হয়, গালি দেয়, তবে সে এ কথাই বলবে যে আমি রোজাদার।'

[সহীহ বুখারী শরীফ: সাওম অধ্যায় ২৫২ পৃষ্ঠা, সহীহ মুসলিম: ১ম খ. ৪২৭ পৃ. , মোয়াত্তা ইমাম মালেক সাওম অধ্যায় ৯৭পৃষ্ঠা, নাসাঈ: ২৫৫পৃষ্ঠা]

অধিকন্তু সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোজার ঢাল কিসের দ্বারা ছিদ্র হয়ে যায়? তিনি বললেন, 'মিথ্যা কথা ও গীবতের দ্বারা।'

[মাজমাউল ফাওয়ায়েদ: ১২৫ পৃষ্ঠা মিরাট]

সুতরাং কোন কোন আলেম এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিমত প্রদান করেছেন যে, 'রোজা যেমন খানা-পিনার দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যায়, তেমনি গুনাহর দ্বারাও ভঙ্গ হয়ে যায়।

[ফতহুল বারী: ৪ খ. ১৮৮পৃষ্ঠা]

১১. সকল ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে রোজাকে তাকওয়ার আসল বুনিয়াদ এজন্যও সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, এটা হলো নিশ্চুপ প্রচ্ছন্ন এবাদত। যা রিয়া এবং লোক দেখানো প্রবণতা হতে মুক্ত। যক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বেচ্ছায় তা প্রকাশ না করে, অন্যদের কাছে এর গোপন রহস্য প্রকাশ পায় না। আর এই বস্তুই হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল এবং আখলাকের বুনিয়াদ।

১২. এই ইখলাস এবং রিয়া বিবর্জিত হওয়ার প্রভাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ পাক তার সম্পর্কে বলেছেন, রোজাদার আমার সন্তুষ্টির জন্য খানা-পিনা এবং সুস্বাদু বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করেছেন এ জন্য 'রোজা আমরাই জন্য এবং আমিই এর বিনিময় প্রদান করব।'

[সহীহ বুখারী শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক: সাওম অধ্যায়]

১৩. রোজা যেহেতু ধৈর্যের একটি শ্রেণী বরং এতটুকু বলাই সঙ্গত যে, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা বরণ করার সহজতর উপায় হচ্ছে রোজা। এ জন্য যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য দোয়া ও ধৈর্য ধারনের প্রতি নির্দিষ্টভাবে হেদায়েত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা সাহায্য কামনা কর, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে।' [সূরা বাকারাহ: রুকু- ৫]

দোয়া ও প্রার্থনা করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সব সময়ই সম্ভব। কেননা তা হচ্ছে মানুষের ঐচ্ছিক জিনিস। কিন্তু ধৈর্যের অনুশীলন ঐচ্ছিক জিনিস নয়। কেননা নৈসর্গিক সমস্যাবলী ও বিপদাপদ আপতিত হওয়া মানুষের ঐচ্ছিক বস্তু নয়। এজন্য এর শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে শরীয়ত রোজাকে নির্ধারিত করেছে। এজন্য উপরোক্ত আয়াতের 'ছবর' শব্দের অর্থ রোজা করা হয়েছে।

[তফসীরে ইবনে জারীর তাবায়ী: ১ম খ. ১৯৯ পৃ. মিশর]

১৪. এ সকল কারণে রোজা ঐ সকল পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাহদের অপরাধ গোপন রাখা, অপরাধ ক্ষমা করা এবং বৃহৎ বিনিময়ের অঙ্গীকার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'রোজাদার পুরুষ এবং মহিলা, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ এবং মহিলা, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং মহিলা, তাদের জন্য আল্লাহ পাক প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও বৃহত্তর বিনিময়। [সূরা আহযাব: রুকু-৫]

এতে সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে, রোজা যেমন আমাদের বস্তুভিত্তিক অপরাধসমূহের কাফফারা, অনুরূপভাবে আমাদের রূহানী গোনাহসমূহেরও কাফফারা ও প্রতিষেধক।